ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' : অনালোকিত ইতিহাসের আলোকিত অধ্যায়

শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপ হরতাল হয়েছিল
সেদিন আকাশে জলভরা মেঘ বৃষ্টির বেদনাকে
বুক চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল।
এই পৃথিবীর আলো-বাতাসের অধিকার পেয়ে
পায়নি যে শিশু জন্মের ছাড়পত্র, তার দাবি নিয়ে
সারা কাকদ্বীপে কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি
কোন অঙ্কুর মাথাও তোলেনি।'

— (চন্দনপিঁড়ি : অহল্যা মা - সলিল চৌধুরী)

হ্যাঁ, তেভাগা আন্দোলনের বীরাঙ্গনা, চন্দনপিঁড়ির অহল্যা মা'র সকরুণ আত্মত্যাগের কাহিনি— আধুনিক কবি সাহিত্যিকদের কলমের খোঁচায় স্থান করে নিয়েছে। চন্দনপিঁড়ির মৃত্তিকাতে অহল্যা, উত্তমী, বাতাসী, দেবেন দাস, গণেশ ভুঞা-দের রক্তের দাগ— কবি-সাহিত্যিক তথা মননশীল ব্যক্তিবর্গকে ভারাক্রান্ত করেছে। এমনকি 'জলভরা মেঘ - বৃষ্টির বেদনাকে' বক্ষে ধারণ করে — তার অংশীদার হয়েছে। 'আলো-বাতাসের অধিকার পেয়ে' ও বাঁচার অধিকার পায়নি যারা — তাদের বেদনায় ব্যথিত বেদন গাছ— নতুন অঙ্কুরোদগম থেকে বিরত থেকেছে সেও।

জমিদার-জোতদার তথা মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে 'সুন্দরিকা-দোয়ানিয়া'র পার্শ্ববর্তী (কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, চন্দনপিঁড়ি, শিবরামপুর) এলাকায় সংগঠিত কৃষক-শ্রমিক-মেহেনতি মানুষের দীর্ঘকালের পুঞ্জিত ক্ষোভের রক্তাক্ত প্রতিবাদই তেভাগা, — যার মৌল দাবি— উৎপাদিত ফসলের দুই তৃতীয়াংশ বর্গা চাষীর প্রাপ্য। ১৯৪৬-৪৭ সালে সংগঠিত এই অনালোকিত ইতিহাসের এক অধ্যায়কেই পটভূমি করে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় রচনা করলেন— 'স্বজনভূমি'-(১৯৯৪)।

১৯৪৬ সালের ১৬ই নভেম্বর সংগ্রামী সুনীল চট্টোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার প্রতিবেদনে লিখছেন "গত ৮ই নভেম্বর কাকদ্বীপে পৌঁছে বুদাখালি গ্রামে যাই। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে লালঝাণ্ডা উড়ছে। খবর পেয়েছি... সুন্দরবনের সংঘবদ্ধ কৃষক এই লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে... দাবি তুলছে জমিদারের খামারে ধান তুলবো না। দশ আনা ধান চাষির, ছ'আনা জমিদারের। ভাগচাষীর স্বত্ব স্বীকার করতে হবে।" এই বিদ্রোহের ছত্রছায়ায়

হাজির ছিলেন অশোক বোস সহ বহু কমিউনিস্ট। ১৮ই নভেম্বর সুনীল ব্যানার্জির সভাপতিত্বে কাকদ্বীপের ডাকবাংলো মাঠে এক বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হয় — সেখানে ভাগচাষীদের নেতৃবৃন্দ কংসারী হালদার, যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, বটকৃষ্ণ মণ্ডল, মানিক হাজরা— প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ জ্বালাময়ী বক্তব্য পেশ করেন। কাকদ্বীপ এলাকার নেতৃত্বে ছিলেন যতীন মাইতি।[১] অতঃপর উন্মত্ত জনতা জোতদার নায়েবদের কাছারি পোড়াতে শুরু করল। খুনোখুনি-রক্তারক্তি। শিবরামপুরের নগেন দলুই, বুধাখালির সুরেন, সুধীর, নীলকণ্ঠ— পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। জমিদারশ্রেণি ও শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার্থে পাঁচশো সশস্ত্র পুলিশ কাকদ্বীপে পৌঁছায় ১৯৪৮ সালের ১৬ই নভেম্বর। কাকদ্বীপের দক্ষিণে সপ্তমুখী নদীর মোহনায় 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া'র পার্শ্ববর্তী চন্দনপিঁড়ি গ্রামে পুলিশের সঙ্গে অসম যুদ্ধে আত্মবলিদান করে অহল্যা-উত্তমী বাতাসী, দেবেন দাস, গণেশ ভুঞা, গজেন মালি, অশ্বিনীরা।[২] তৎকালীন নবগঠিত কংগ্রেস সরকার 'কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলা' (Kakdwip Conspiracy Case) দায়ের ক'রে ৩০ জন জননেতার বিরুদ্ধে। কংসারী হালদার, অশোক বোস, প্রমুখের হুলিয়া জারি হয়। ৯জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।[৩] ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণটি ঔপন্যাসিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় চিত্রায়িত করেছেন 'স্বজনভূমি', উপন্যাসে।

শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রান্ত অঞ্চল নয়, দক্ষিণবঙ্গের মেদিনীপুরের মহিষাদল, নান্দীগ্রাম, সুতাহাটা, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, মালদহ, দিনাজপুর, রঙপুর এমনকি অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলেও এই কৃষক আন্দোলনের প্রসারতা লক্ষ্যণীয়। 'Last Battle of Bengal peasants Under British Rule' - গ্রন্থে অবনী লাহিড়ি জানাচ্ছেন — আন্দোলনের প্রথমে কেন্দ্রিয় ভূমিকায় ছিল ক্ষেত্রী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষজন। পরবর্তীকালে সাঁওতাল, ওঁরাং, বাজ প্রভৃতি উপজাতি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ও সামিল হয়েছিল এই আন্দোলনে।[৪]

স্মরণীয় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষাণ সভা তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয় ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে। ফ্লাউড কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্গাচাষী জমির মালিককে দেবে উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের একভাগ— 'তেভাগা'-র এই দাবির প্রেক্ষিতেই বাংলার কৃষকশ্রেণি সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল।[৫] এছাড়াও কৃষাণসভার আরো কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দাবি— ক. বর্গাজমিতে দখলিস্বত্ত্ব প্রদান। খ. মহাজনদের দেওয়া টাকা বা ধানের উপর সুদের হার বছরে ১২.৫% ধার্য। গ. দেরাবাড়ি, দরকাটি ও করানি প্রথাকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা। ঘ. গ্রামে-গঞ্জে ধর্মগোলা, লক্ষ্মীগোলা, স্থাপন। ঙ. ভূমিহীন কৃষকদের পতিত জমি বিলির বন্দোবস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।[৬] কেননা, বাংলার কৃষক

সম্প্রদায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পেষণে এমন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল যে তার থেকে নিষ্কৃতির উপায়ন্তর না পেয়ে বাধ্য হয়েছিল বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে নিতে। ১৯৩৭-১৯৪২ সাল পর্যন্ত কৃষক সম্প্রদায়কে পিষ্ট হতে হয়েছে জোতদার জমিদারদের জাঁতাকলে। এই সময়ে প্রথা ছিল, বর্গাদার উৎপাদিত ফসলের ৬৬% দেবে মালিককে, অধিয়াররা দেবে ৫০% । এছাড়া একাধিক অবৈধ নজরাণা সেলামী, করালী, পাটনী, দারোয়ানি, খামার চাঁচানি, — ইত্যকার কর অধিয়ারদের প্রদান করতে হত— যার সুস্পষ্ট ছবি আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে। সেখানে ও আগমনী, নজর, সেলামী, বাজে আদায়, ডাক ট্যাক্স প্রভৃতির কর পেষণে কৃষকশ্রেণির সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল।

কৃষকদের সুদের হার ছিল ১৫০% -২০০% যাকে বলা হত 'দেরাবাড়ি-দুনোবাড়ি'। তদুপরি ১৯৪২-এ মেদিনীপুর ঘূর্ণিঝড়-বন্যা প্লাবনে বিধ্বস্থ হয়। নিরাশ্রয় অনাহারক্লিষ্ট কৃষক সম্প্রদায় জীবনধারণ ও সন্তান সন্ততির মুখে অন্ন তুলে দিতে — আন্দোলন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখতে পায়নি সেদিন। বুড়লের প্রভাস রায়, ফলতার যতীন রায়, কাকদ্বীপের তিন বিপজ্জনক মাইতি, যতীন, গুণধর, জগন্নাথ এবং হেমন্ত ঘোষাল — এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।

জাতির জনক মহাত্মাগান্ধী ও কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু কৃষকদের দাবির সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি মহাত্মাগান্ধী বললেন "আমি বিশ্বাস করি, যে জমি চাষ করে না, উৎপন্ন ফসলের তার অধিকার নেই। অর্ধেকের বদলে জমির মালিকের প্রাপ্য ফসলের এক তৃতীয়াংশ হলে, তা সকলেরই মেনে নেওয়া উচিৎ"।[৮] এই কথার সমর্থন জ্যোতি বসুর বক্তৃতাতেই উঠে এসেছে (১৯৪৭, ৩০শে জানুয়ারি) — "কৃষি জমির বর্গাদারকে তার উৎপাদিত ধানের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ দেবার আইনসিদ্ধ অধিকার সরকার কর্তৃক পরিত্যাগ করার স্বেচ্ছা প্রণোদিত এবং বিশ্বাসঘাতক নীতির আমি তীব্র নিন্দা করছি। কৃষকদের ৪১% বর্গাদার। তারা যে ধান উৎপন্ন করবে, তার দুই তৃতীয়াংশ ভাগ তাদেরই প্রাপ্য।[৯]

'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া'— যেটি 'বড় গাঁও সপ্তমুখির এক মুখে' অবস্থিত— তার দুই পার্শ্ববর্তী ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডই 'স্বজনভূমি' উপন্যাসের বেধ। ঔপন্যাসিক স্থানিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন— 'দক্ষিণে, পূবে পশ্চিমে নোনাজলের নদী... দূরে ঠাকুরাণ... আরও দূরে ধঞ্চি, বিজিয়াড়া জঙ্গল'। 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া'-র এক পাশে কয়েক হাজার মনুষ্য বসবাস নিয়ে চন্দনপিঁড়ি মৌজা, যেটি আদতে একটি দ্বীপ— অন্যপ্রান্তে শিবরামপুর। এই ভৌগোলিক সীমাই 'স্বজনভূমি'র ক্ষুদ্রতম অবস্থান। 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়া'র জলপ্রবাহের

মতোই উপন্যাসের চরিত্রগুলির জীবনপ্রবাহ কখনো দ্রুত, কখনো বা মন্থর গতিতে প্রবহমান।

আলোচ্য উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের সমকালীন অথচ জীবিত চরিত্রগুলি হল— অতুল কামিল্যা, কমলাকান্ত ভূঁইয়া, দেবেন মালি, খগেন মাইতি, নিতাই, গুণধর মালিক, গুরুপদ, ডিংরাবাবু, রতিকান্ত প্রমুখ। এই জীবন্ত চরিত্রগুলির স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত তেভাগা আন্দোলনের নিহত বীর-বীরাঙ্গনারাই হল — মা অহল্যা, বাতাসী, গজেন মালি, ভূপতি, ধীরেন্দ্র, মঝঝুম শেখ প্রমুখ। এই মৃত চরিত্রগুলিই উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেছে। আধুনিক উপন্যাসে আখ্যান নয়, চরিত্রের অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণ এবং আত্মকথনের মাধ্যমে জীবনযন্ত্রণা ও জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ উদঘাটনই মুখ্য — 'স্বজনভূমি'-তে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

'স্বজনভূমি' উপন্যাসের পটভূমি (১৯৪৬/৪৭) ও রচনাকালের (১৯৯২) মধ্যে কালগত ব্যবধান ৪৫/৪৬ বছর। ১৯৪৬-৪৭-এর প্রেক্ষাপট ঔপন্যাসিক ১৯৯২-৯৩ সালে বসেই বর্ণনা করছেন। ফলত: তেভাগা সমকালীন চরিত্রগুলির প্রায় প্রত্যেকেই বার্ধক্যে উপনীত। উপন্যাসের নিবিড় পাঠে আমরা ১৯৯২-৯৩-এর রচনাকালটি চিহ্নিত করতে পারি— অন্তত পক্ষে তিনটি জায়গা—

ক. 'বাপুরে! যুদ্ধ লাগছে কোন মরুভূমির তেলওয়ালার দেশে, এখানেও বিড়ির দাম বাড়ছ্যে!!'(পৃ. ৯-১০) দোকানদার মালিকের সঙ্গে যুবক সারেং অর্জুনের এই বাগবিতণ্ডা ১৯৯১-৯২ সালে ইরাকের উপর মার্কিনী হামলা — তথা উপসাগরীয় যুদ্ধকেই সূচিত করছে।

খ. তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম সদস্য মঝঝুম শেখের জামাই সলেমানের কথাতেই ফুটে ওঠে '৯২ সালের বাবরি দাঙ্গার প্রসঙ্গ— 'অতবড় শহর (কলকাতা) বিদেশ জায়গা... কোথায় আবার মন্দির মসজিদ লিয়া দাঙ্গা ফাঙ্গা বাধি যায়'(পৃ. ৫৮)— সলেমানের এই বক্তব্যে কৃষ্ণ দয়াল — হরেনের হৃদয়ে ঘূর্ণি আলোড়িত হয় — 'কোথায় অযোধ্যা তার ধাক্কা কোলকাতায়।'

গ. চন্দনপিঁড়ির শহিদ পাড়ার মেটে রাস্তার পাশে অবস্থিত তেঁতুল গাছটির প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক স্বয়ং লিখছেন — 'উনিশশো পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের তেঁতুল গাছটা বিরানব্বই-তিরানব্বই-এর ডালপালা ছাড়িয়ে ছায়া দেয়।'(পৃ. ১৫২) ফলত স্পষ্টতই দেখি, উপন্যাসের জীবিত চরিত্রগুলি ২৫/৩০ বছর বয়সের রুদ্ধশ্বাস ও মর্মান্তিক কাহিনি স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত করছেন, পড়ন্ত বেলাতে এসে। তাই স্বভাবতই আবেগের আতিশয্য চোখে পড়ে।

ঔপন্যাসিকের শিল্পনৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে। স্মৃতির পরে স্মৃতির মালা গেঁথে

উপন্যাসটির কায়া নির্মাণ করেছেন ঝড়েশ্বর। তাতেই দৃষ্ট হয়—

ক. অতুল কামিল্যার স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলন।

খ. বন্ধু খগেনের দৃষ্টিতে অতুল কামিল্যা।

গ. দেবেন মালির স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলনের শহিদ পিতা গজেন মালি।

ঘ. কমলাকান্তের স্মৃতিতে যোগেনবাবু ও অহল্যা মা।

ঙ. কমলাকান্তের স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলন

চ. নিতাই-এর দৃষ্টিতে অন্ধ পিতা ভূপতি ও তেভাগা আন্দোলন

ছ. মহেন্দ্র'র নাতি ধীরেন্দ্র'র দৃষ্টিতে তেভাগা।

জ. নিতাই-ধীরেন্দ্র'র শহিদবেদি দর্শন ও তেভাগা আন্দোলনে নিহত অশ্বিনী-সরোজিনীর মর্মন্তুদ কাহিনি।

ঝ. রতিকান্তের স্মৃতিতে মা অহল্যার নিদারুণ আত্মত্যাগ ও তেভাগা আন্দোলনে পুলিশি সন্ত্রাস। এটি উপন্যাসের মূলবৃত্তান্তও বটে।

ঞ. অতুল কামিল্যার স্মৃতিতে শ্যালক বিজয় ও তেভাগা-স্মৃতি।

এভাবে আশ্চর্য কৌশলে ঔপন্যাসিক জীবিত চরিত্রদের মুখ তেভাগা আন্দোলনে নিহত শহিদদের কীর্তিকলাপ ও রুদ্ধশ্বাস কাহিনি বর্ণনা করে 'স্বজনভূমি'কে পূর্ণতা দান করেছেন। তা অবশ্যই আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ক. অতুল কামিল্যার স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলন।

'স্বজনভূমি' উপন্যাসের সূত্রপাত গুণধর মালিকের দোকানের সামনে অর্জুনের সঙ্গে অতুল কামিল্যার বাগবিতণ্ডায়। একালের যুবক অর্জুন তেভাগা আন্দোলনের বীর সৈনিক অতুলকে ব্যঙ্গ করে। গুণধরকে উদ্দেশ্য করে অতুলকে বলে — 'তোমাদের আন্দোলনের লোকদের কীর্তি। এক পুইস্যা দাম (বিড়ি) বাড়লে পাঁচ পুইস্যা পুষিয়ে নেয়'— অর্জুনের ব্যঙ্গে মর্মাহত হয় কামিল্যা। আক্রোশে ফেটে পড়ে— 'হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে বন্দুকের মতো'। তার শিরায় শিরায় সংগ্রামী চেতনা। 'কবে কোন মান্ধাতার আমলে ফুটুস করে পিস্তল ফাটিয়ে নায়েব গোমস্তা, দু'চারটে পুলিশ জখম করছ্যে, সৌ মহাভারত অখন ও শোনায়'— অর্জুনের এই শ্লেষবিদ্ধ বাক্য শ্রবণে কামিল্যার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে— 'তুই... তুই কী জানিস সৌ বিপ্লবের, সে দিনকার ছোকরা'।

সত্যিই তো, নতুন প্রজন্ম সেই আন্দোলনের ভয়াভয়তা ও আন্দোলনকারীদের অসীম সাহসিকতার পরিচয় জানবে কি করে? কামিল্যার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের সেই ভয়াবহ রাতের কথা। কলকাতা থেকে আগত অশোক বোস, কংসারি হালদার, দক্ষিণের প্রভাস রায়দের সঙ্গে এদেশের মন্মথ ঘোড়ই, জগন্নাথ মাইতিদের

পরামর্শে গাঙ সাঁতরে গভীর রাত্রে যেতে হত চন্দনপিঁড়ির গোপন আস্তানায় খবর নিতে এবং কাকপক্ষী জাগার পূর্বেই ফিরে এসে বৃত্তান্ত শোনান— কামিল্যার এই সাহসিকতা এবং কীর্তিকলাপ তরুণ প্রজন্ম জানবেই বা কিভাবে?

হাজরার কাছারি বাড়ির পুলিশ ক্যাম্পে আগুন লাগানোর ভার তার উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। গজেন মালি তাকে জানিয়েছিল, 'এটা পার্টির সিদ্ধান্ত'। কামিল্যা পার্টির সিদ্ধান্ত মানতে এক পা-ও পেছপা হয়নি, ''এই জঙ্গল সাফাই করে চাযের জমি, বসবাসের যোগ্য ভূমি তৈরি করা মানুষ, এই লাট সুন্দরবন আমাদের। তাদের তো বটে, নিজের মা বোনেদের ইজ্জত রক্ষা... লাটদার চাকদারদের নির্যাতন থেকে যদি রক্ষা করতে আমার জীবন দিতে লাগে দুবো— দুবো— শহিদ ক্ষুদিরাম কচি বয়সে প্রাণ দিচ্ছে... না হয় আমি'ই দুবো... দাও... অস্ত্র... কথা দিলাম।''(পৃ. ১২) — সেদিনের সেই যৌবনোদ্দীপ্ত অঙ্গীকারের কথা আজ স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

খ. বন্ধু খগেনের দৃষ্টিতে অতুল কামিল্যা।

তেভাগা আন্দোলনের এককালের সহযোদ্ধা বন্ধু খগেনের দৃষ্টিতে অতুল কামিল্যার কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। কামিল্যা পেশায় ছিলেন কামার। খগেন কামিল্যাকে 'মেকার' নামেই ডাকে। পিস্তল, পাইপগান, ভেঙে চুরে পিষিয়ে সাইজ করে দিত এক নিমেষে। ছেনি, হাতুড়ি, লোহাকাটা করাত দিয়ে মুহূর্তেই বানিয়ে দিত 'জীবন্ত পাইপগান'— যা তেভাগা বিপ্লবীদের জঙ্গলের ঘাঁটিতে চালান করা হত। সেখানে চলত বিজয় মণ্ডল, ভূষণ কামিল্যা, গজেন মালিদের 'গেরিলা ফাইটের মহড়া'।

গ. দেবেন মালির স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলনের শহিদ পিতা গজেন মালি।।

রোগা লম্বাটে চেহারার দেবেন মালি গাঙ পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পায় মাস্টারের ভি.ডি.ও. হলে শো চলছে। আর তখনই স্মৃতি পটে ভেসে ওঠে বাবার কথা। হৃদয় খুঁড়ে যন্ত্রণা ও চাপা কষ্টের গোঙানী বেরিয়ে আসে দেবেনের। এই দেশের জন্যই গজেন মালি পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে নদী বক্ষে, ডিঙির উপর ভেসে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর, জেলে পচেছে বহু বছর। আজ বেঁচে থাকলে 'বগড়া জঙ্গলের' পরিবর্তে 'জেনারেটরের আলো'— সিনেমার পর্দায় ভেসে ওঠা ছবি— কত-ই কি দেখতে পেত। কিন্তু এই আক্ষেপের থেকে বড় হয়ে উঠেছে বাবার প্রতি সম্ভ্রম ও গর্ব : ''কমিউনিস্টদের... সন্ত্রাসবাদীদের নেতা অশোক বোস লাটদারদের ত্রাস গজেন মালিকে হাতে নাতে ধরা চাই। অত রোগা বাপটাকে ধরতে সেই উনিশশো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশে তেভাগার মুভমেন্ট দমাইতে কত বন্দুক রাইফেল ধরি মিলিটারি পুলিশ।''(পৃ. ১৪)

'কী এমন ব্রেন ছিলো... কী এমন নির্দেশ দিতো কর্মী কমরেডদের, যাতে এসব লাট

এলাকায় আগুন জ্বলতো'— পুত্র দেবেন মালি পিতার এই অসীম সাহসিকতা, তেজস্বীতা ও বুদ্ধির মাপকাটি নির্ণয় করতে পারে না। নাই পারুক। বাবার জন্য তার গর্বের অন্ত নেই। উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ চাষির— তেভাগার এই বন্টনকে কেন্দ্র করে কত কাছারি পুড়িয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেই আন্দোলনের ফলাফল পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করছে— 'বাপ-কাকারা এমন মুভমেন্ট করছিলো বলেই না আজ দেশময় সৌ আইন করছে দেশের গরমিন্ট'— এখানেই শান্তি, স্বস্তি, গর্ব।

ঘ. কমলাকান্তের স্মৃতিতে চন্দনপিঁড়ির শহিদ বীরাঙ্গণা অহল্যা ও স্বামী যোগেন।।

মা অহল্যা ও বাবা যোগেনের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে তাদের সন্তান রতিকান্ত। মামা কমলাকান্ত তেভাগা আন্দোলনে তাদের সহযোদ্ধা। বৃদ্ধ কমলাকান্তের মনোদর্পণে ভেসে ওঠে সেই সব দিনের স্মৃতি। যোগেনের (গো-চিকিৎসক) পরপোকারিতা নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম ও মা অহল্যার গুণকীর্তন করে। রতিকান্ত মুগ্ধ হয়ে শোনে— "তোর বাপ যতো বড় ঝড় জল বান হউক, কেউ একবার দোরগোড়ায় আসি গেলে যদি কয়, যোগিনবাবু গো — গরুটা হেলে বলদটা যে যায় গো— ফিরাতো নি। তোর মা অহল্যাও রাগারাগি করতোনি। বরং কইতো... এই জঙ্গল হাসিল করা দেশ। মানুষ আর গরু-বাছুর লিয়ে তো সংসার। যাইতে পারো তো যাও— কমলকে সঙ্গে লিবো তো?"(পৃ. ৩৬) — কমলাকান্ত যেন হৃদয় ঢেলে বাক্য সাজায়, আর অস্ফুট উচ্চারণে ফুটিয়ে তোলে সেদিনের সেই রোমহর্ষক কাহিনি। ছেলে রতিকান্তের মনোদর্পণে ভেসে ওঠে মায়ের রেখাচিত্র ... আকার... প্রতিমা।

ঙ. কমলাকান্তের স্মৃতিতে তেভাগা আন্দোলন

কমলাকান্ত ভুঁইয়া তেভাগা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। অতুল কামিল্যার এককালের সহকর্মী। আজ জীবনের প্রান্ত বেলায় দাঁড়িয়ে সে ও সুখস্মৃতি অনুভব করে গৌরবান্বিত হয়।' 'পাতলা ঠোঁটে লালচে মাড়ি মেলে হাসে'। কাকদ্বীপ কন্‌সপিরেসি কেসে (কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলা) কারাবরণ করেছিল। তখন তার ব্যাঘ্রসম চেহারা। সেদিনের যৌবনোদীপ্ত দুঃসাহস আজ স্মৃতি পটে উদিত হয়। পুলিশের ছদ্ম সাহসিকতাকেব্যঙ্গ বানে বিদ্ধ করে : "বাপুরে কি সাহসী পুলিশ। পাঁচজন, তায় আবার টোঁটা ঠাসা রাইফেল হাতে এই একলা লেটো লোকটাকে ধরতে। হইতে যদি খালি হাতে পুলিশ, না হয় অস্ত্র হাতে একলা পুলিশ, বাগে পাইলে ধরি খিঁচে ফেলি দিতাম।"(পৃ. ৩৪)

নিরস্ত্র অবস্থায় খালি হাতে সেদিন যুদ্ধ করতে হয়েছিল, সেই দীর্ঘশ্বাস এখনও বুকে বাজে কমলাকান্তের : 'ইস্... আমানকে... আমানকে সব লোকেদের ঘরে যদি বান্দুক বোমা থাকতো...। তাহলে কি আমানকে অমন করে বাঁধি লে যাইতে পারিত?'(পৃ. ৩৪)

চ. নিতাই-এর স্মৃতিতে অন্ধপিতা ভূপতি ও তেভাগা আন্দোলন।।

তেভাগা আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী ভূপতির ছেলে নিতাই বর্তমানে ফরেস্টর অফিসার। সাইকেল মোছা গেঞ্জিটা ঝাড়ার সময় এক বিকট বোমা ফাটার আওয়াজ' শ্রবণে নিতাই-এর 'বুকের ভিতর কামড়ায়'। এই অনুসঙ্গেই নিতাই-এর মনে পড়ে বাবা ভূপতির অন্ধত্ব প্রাপ্তির কথা 'একটা... একটা আওয়াজ-ই তো বাপটাকে অকেজো করে দিল'। তৎক্ষণাৎ নিতাই-এর স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয় তেভাগা আন্দোলনের ভয়ঙ্কর সেইসব দিন, যখন 'চন্দনপিঁড়ি, দরিপুর, বুধাখালি, শিবরামপুর... গোটা লাট জুড়ে চাষির সশস্ত্র আন্দোলন তুঙ্গে, কংসারি হালদার অশোক সেন কমিউনিস্ট লিডাররা গোপন ঘাঁটি থেকে সব পরিচালনা করছে। লাটদার চকদাররা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে... নায়েব গোমস্তাদের তেজ মরে আসছে...। লিডার কর্মীদের উপর নির্দেশ এল, না। এখন অস্ত্র নামাও।"(পৃ. ৮৯) সেই যুদ্ধাস্ত্রের দায়িত্ব বর্তেছিল ভূপতির উপর। গাঙ চড়ে মাটি খুঁড়ে অস্ত্রগুলো লুকানোর প্রাক্কালে বিকট বিস্ফোরণে ভূ-পতির চোখ অন্ধ হয়ে গেল। সেই থেকে এলাকায়, 'অন্ধ কমরেড' ভূপতি। বোমা ফাটার সেই আওয়াজের সঙ্গে সাইকেল মোছার গেঞ্জি ঝাড়ার আওয়াজ কোথাও যেন সমীকৃত হয়ে যায় নিতাই-এর মনে। নিতাই-এর অন্তকরণে নতুন করে জেগে ওঠে ভয়, আতঙ্ক, সঙ্গে গর্ব, সম্মানবোধও।

ছ. নিতাই-ধীরেন্দ্রর শহিদ বেদি দর্শন ও তেভাগা আন্দোলনে নিহত অশ্বিনী-সরোজিনীর মর্মন্তুদ কাহিনি।।

নিতাই-এর সাইকেলের পিছনে সওয়ার হয় একদা তেভাগা আন্দোলনের কর্মী মহেন্দ্রর নাতি ধীরেন্দ্র। রাস্তার পাশে চোখে পড়ে শহিদ বেদি। বেদির গায়ে শ্বেত পাথরের বর্ণ ফুটিয়ে খোদাই করা —

শহিদ স্মরণে

১৯৪৮-৪৯ সালের ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের অমর শহিদগণ—

কম: অহল্যা দাস — উ: চন্দন পিঁড়ি
কম : বাতাসী সিংহ — দ: চন্দন পিঁড়ি
কম: সরোজিনী দাস — দ: চন্দন পিঁড়ি
কম: অশ্বিনী দাস — দ: চন্দন পিঁড়ি
কম: গজেন্দ্রনাথ ভূঁইয়া — দ: চন্দনপিঁড়ি
কম: দেবেন্দ্রনাথ বর্মণ — দ: চন্দন পিঁড়ি
কম: নগেন্দ্রনাথ দলুই — শিবরামপুর

বেদির অদূরে টিউবওয়েল। নিতাই-এর চোখে পড়ে শ্বেতপাথরে খোদিত অশ্বিনীর নাম। আর তখনই ঔপন্যাসিক সুকৌশলেই পাঠককে জানান দেন, অশ্বিনী হত্যার মর্মন্তুদ

কাহিনি। স্বাধীন গরমেন্টের পুলিশের হিংস্রতা। তেভাগার মিছিলে মিলিটারি রাইফেল গর্জে ওঠে। অশ্বিনীর বুক ঝাঁঝরা করে দেয় বুলেট। প্রাণ ওষ্ঠাগত। জল চাই, একটু জল। বোন সরোজিনী বাদাবনের লবনাক্ত জল আঁচলে ভিজিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী ভাই-এর মুখে ধরেছিল। আর তখনই 'রাইফেলের ডগায় লাগানো ছুরির ফলা গেঁথে দিল বোনটার তলপেটে।' ভাই-এর মুখে শেষ জলটুকু দিতে গিয়ে বোনের জিহ্বাও হয়ে ওঠে 'চৈত্রের শুকনো বালিয়াড়ি'। অতএব ভাই-বোনের একই সঙ্গে মৃত্যু। নিতাই-এর তাই স্পষ্ট উপলব্ধি : 'এই জায়গায় সেজন্য গলা ভিজাতে আর জল মাঙতে হয় না'। পঞ্চায়েত কল বসিয়েছে। প্রাণভরে জলপান করে নিতাই-ধীরেন্দ্র।

জ. অতুল কামিল্যার স্মৃতিতে শ্যালক বিজয় ও তেভাগা আন্দোলন।।

আত্মজনের অসহায়তা কামিল্যার মনে দাগ কাটে বরাবরই। উপন্যাসে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ। জীবনের প্রান্তবেলায় শ্যালক বিজয়ের কথার সূত্রেই মনে পড়ে যায় তেভাগা আন্দোলনের কথা। জোতদার জমিদারদের ত্রাস গজেনমালির মুণ্ডুর মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল দশ হাজার টাকা। তাই আত্মগোপন করা ছাড়া গজেনের অন্য কোন উপায় ছিল না। সেই গজেন মালির বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে বিজয় মাসের পর মাস পলাতক— আত্মগোপনকারী। ডিঙি নিয়ে বছরের অধিকাংশ সময় সমুদ্রের উপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। হিংস্র বন্য জীবজন্তু অধ্যুষিত জঙ্গলে খাদ্যহীন অবস্থায় কালাতিপাত করেছে কত রাত, চড়ায় কাটিয়েছে দিনের পর দিন — গজেনের সঙ্গী হয়ে।

ঝ. রতিকান্তের স্মৃতিতে মা অহল্যার নিদারুণ আত্মত্যাগ ও তেভাগা আন্দোলনে পুলিশি সন্ত্রাস।।

তেভাগা আন্দোলনে নিহত শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের সূত্রেই ঔপন্যাসিক অহল্যা মা'র নিদারুণ আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, পুত্র রতিকান্তের জবানীতে। বেলা ন'টার শহিদবেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য মিছিল বেরোবে। মেয়ে অঞ্জলি মালা গাঁথতে ব্যস্ত। ১৪-১৫ বছরের অঞ্জলির নানান জিজ্ঞাসা—'আজ ঠাম্মার জন্মদিন, রতিকান্ত জবাব দেয় — 'তোর ঠাকমা অহল্যার মৃত্যুদিন। পেটে বন্দুকের টোটা মেরেছিল।' ছেলে উত্তম মেয়ে অঞ্জলি ও ভূপতির ছেলে নিতাই-এর নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমেই রতিকান্ত মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু কাহিনি বর্ণনা করছেন।

২০শে কার্তিক। পাকা ফসলে মাঠ ভর্তি। জমিতে ধান কাটা শুরু হয়েছে। এমন সময় সেনেদের কাছারির নায়েব পুলিশের আগমন, কৃষক সমিতির কমিউনিস্ট সেক্রেটারী রাখাল জানাকে অ্যারেস্ট করতে। সংবাদ মাত্রই, মেয়েরা বটি, ঝাঁটা, নিয়ে পুলিশের দিকে এগিয়ে গেছে। উন্মত্ত জনতার চোখে পড়ে, সেনেদের কাছারির নায়েব পরেশ দাস

পুলিশকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে— বিশ্বাসঘাতক রাইচরণও সঙ্গে।

আঠারো উনিশ বছরের ঘটনা আজ পঁয়ষট্টি—ছেষট্টি উপনীত রতিকান্ত বলতে গিয়ে পারম্পর্য হারিয়ে ফেলে। হৃদয় উত্তাল, বুকে যেন জগদ্দল পাথর। কমলাকান্তের বাড়ির কাছে ১২ জন সশস্ত্র পুলিশ এগিয়ে আসছে। লালমোহন ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলের নলের উপর— 'পুলিশ, তোমাদের বন্দুক লিয়া ফিরা যাও'। সম্মিলীত জনরোষে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। ক্রুদ্ধ জনতা পরেশকে পাকড়াও করে। হঠাৎ দেখে, কাকদ্বীপের দারোগা ৩২জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে হাজির। পুলিশের পথ আটক করে জনতা। পথ ছাড়ার আর্জি জানায় পুলিশ। রাইচরণও ধমকায়— 'পথ ছাড়ো'। তখন সরোজিনী পিসি রাইচরণের ঝাঁটা কষিয়ে আক্রোশ মেটায় — 'ওই, দেশের মধ্যে পুলিশ আনতিছি — আবার কথা?'

দারোগার বাঁশি বেজে ওঠে— 'ফায়ার! ফায়ার!' তৎক্ষণাৎ পুলিশের গুলিতে একে একে স্বজনভূমিতে ঢলে পড়ে— অশ্বিনী, সরোজিনী, উত্তমী-বাতাসী, অহল্যা, গজেন ভূঞা। ইতিহাসের বালি কাদা স্রোত চাইয়ে রতিকান্ত উত্তরসূরীদের (অঞ্জলি, উত্তম, নিতাই) সামনে ছেঁকে ধরল মর্মন্তুদ কাহিনির নির্যাস : ''ফটাস করে গুলি বিঁধলো অশ্বিনীর বুকে...। জল... জল দিচ্ছিলো বোন সরোজিনী কাদা থেকে আঁচল চুবিয়ে অশ্বিনীর গালে। সরোজিনীর পেট ফুটা করে দিলে।... উত্তমী বাতাসী... মা অহল্যারও। লাঠি হাতে ঝাঁপাইলে গজেন ভুঁইয়া... সেও শেষ!... মা অহল্যা পেটে টোটার জ্বালা নিয়ে একপাক দৌড়ায়... তারপর হাঁটে। গোপালের দোরকে লে যায়ে গালে জল দিছি... দ্বীপের শেষ জল। তারপর বাবার কোলে মাথা... আমার কোলে শুয়ে মা আমার... মাটির মতো ঠান্ডা। তিন মানুষে তিন ভাগ হইলুম।... তেভাগা।''(পৃ. ১২৫/১২৬) হ্যাঁ ব্যক্তি জীবনে ত্রি-ধা বিভক্ত হল রতিকান্ত। আর স্বজন হারানোর যন্ত্রণা মেটাতে পরেশের দেহ টুকরো টুকরো করে সপ্তমুখীর নোনা পাঁক কাদার চরে পুঁতে ফেলল ক্রুদ্ধ জনতা।

এটি-ই উপন্যাসের মূল বৃত্ত। স্বজনভূমি রক্ষার্থে আত্মত্যাগ। স্বজনভূমিতে লেগে আছে রক্তের দাগ। মাটি সে রক্ত শুষে নেয়নি। কেননা, এই ভূমি, এই মাটি লাটদারের নয়, চাষির— 'যে চষে, যে বাস করে তার'। তাই লাটদারের ইজারাভুক্ত জমিতে সমাধি নয়, রতিকান্তের পুকুরপাড়ের বাঁধে, বাজবরণ গাছের তলায় মা অহল্যাকে সমাধিস্থ করা হল। কেন না, মৃত্যুর পরে স্বজনভূমির মাটিই তো পরম প্রাপ্তি— সে প্রাপ্তির পূর্ণতা ঘটেছে মা অহল্যার।

সুতরাং চরিত্রের স্মৃতিতেই অপর চরিত্রের বিশ্লেষণ — এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে এবং জীবিত চরিত্রগুলির স্মৃতিতেই তেভাগা আন্দোলনে নিহত শহিদ বীর-বীরাঙ্গণা

চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের এই অসামান্য শৈলী নির্মাণ করে ঔপন্যাসিক ঝড়েশ্বর কথা সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করলেন, বলা যায়।

মানবচরিত্রের আত্মসমীক্ষা[১০] — আধুনিক উপন্যাসের এই পদ্ধতি — 'স্বজনভূমি'তেও দৃষ্ট। উপন্যাসের অন্তিমে দেখি, অতুল কামিল্যা, কমলাকান্তরা তাদের পূর্বকৃত কাজের আত্মসমীক্ষা করছে। শহিদ পরিবারের সন্তানদের শেষ অবলম্বন— 'পেনশন'— সরকারী অনুদান। কামিল্যা, কমলাকান্ত, রতিকান্তরা সেই 'পেনশন'-ভোগী। কিন্তু 'ফ্রিডম ফাইটার' নিত্যবাবুদের তুলনায় তাদের টাকা যৎসামান্য। কামিল্যার ছেলে শম্ভুর প্রয়োজন দু'হাজার টাকা। 'রামকৃষ্ণ চিত্রকলার আর্টিস্ট বলেছে, তিনমাসের গ্যারান্টি'। কামিল্যার অন্তরে সংশয়, দ্বিধা, উৎকণ্ঠা— দু'হাজার!!' ট্রেজারি অফিসে পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে শম্ভু স্পষ্টই দেখতে পায়— ভূষণ হালদার, নিত্যমাইতিরা (ফ্রিডম ফাইটার বলেই) মাসে সাড়ে সাতশো টাকা পায়, অথচ কামিল্যারা মাত্র তিনশো টাকা। শম্ভুর উপলব্ধি : 'ওদের তিনমাসের টাকায় দু'হাজার দিয়েও বেশি থাকত।' তাই নবীন প্রজন্ম শম্ভু বাবার সামনেই বিরক্তি প্রকাশ করে— 'দুস! তেভাগাটা না করে যদি নিত্যবাবুদের সঙ্গে বৃটিশ তাড়ানোয় থাকতে...।' কামিল্যার বেতের লাঠি মুহূর্তেই সোজা হয়ে যায়। পুত্রের নির্দয়তায় বুকের ভিতরটা নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে যায়। আত্ম সমীক্ষা করে কৃতকর্মের ফল যাচাই করে— ''কত লোকে বলেছিল, কামিল্যা কি করছো? পরে বুঝবে কিছু লাভ হয়নি। হয়নি? না হলে আজ এই কাগজ দেখালেই টাকা! খোদ গরমেন্টের ঘাড়ে দায়িত্ব পড়ে। পৃথিবী মানিয়ে লেয়... ফসলের তিন ভাগ... আইন তো হইছে পেনশন বিলের। তবে কি খুব ভুল করেছি...।''(পৃ. ১৮৪) আত্ম সমীক্ষায় নিজের প্রাপ্যটুকু খুঁজে পায় বলেই অতুলরা এখনো বেঁচে আছে নিজের অতীতকে পাথেয় করে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের শুষ্ক পরিবেশনা নয়; কল্পনার সুরভি সিঞ্চনে তার মেদ-মজ্জা ও কায়া গঠিত হয়। রবীন্দ্রকথিত 'ঐতিহাসিক রস' পরিবেশনার মাধ্যমেই ইতিহাসের ফানুসটার উপর উপন্যাসের 'আমেজ' সঞ্চারিত হয়। 'স্বজনভূমি'-তে ইতিহাসের যে গণ্ডি ঔপন্যাসিক তৈরি করেছেন— সেই গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়েছেন— তাতে সহজেই পাঠক ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির আবেগ ও অনুভূতির অংশীদার হয়ে উঠতে পেরেছে। এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমিকাটি বর্ণিত হওয়ার সাথে সাথে সেই সময়ের সামাজিক অস্থিরতা, প্রাত্যহিক জীবনধারা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংস্কার, পোযাক-পরিচ্ছদ— আচার-ব্যবহার-রুচি-সবই যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিৎ। নতুবা উপন্যাসটি শুধুমাত্র তথ্যের

আকর হয়ে দাঁড়াবে। ঔপন্যাসিকের মৌল বিষয়— 'জীবনের সমগ্রতার সন্ধান।' 'উপন্যাস জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জীবনের এই আত্মীয়তাকে স্বীকার করে নিয়ে উপন্যাসকার জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেন।'[১১] 'স্বজনভূমি' তাই শুধুমাত্র তথ্যে আকর হয়ে ওঠেনি; সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক প্রতিফলনও ঘটেছে। উপন্যাসে সমাজ বিরুদ্ধে প্রেমের সোচ্চার উচ্চারণ যেমন দেখি, তেমনি এসেছে জীবনযন্ত্রণার (agony of life) আর্তি, লোকসংস্কার, আচার-বিশ্বাস, সাক্ষরতা অভিযান— এককথায় জীবনের সমগ্রতার সন্ধান দেয় উপন্যাসটি।

লরেন্সীয় যৌবন-বাসনার উদ্দামতা ও আদিম প্রবৃত্তির উন্মোচন, ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন— উপন্যাসে দেখি নীলকণ্ঠ—কনকা (দেবর-বউদি), ছায়া ও নতুন পঞ্চায়েত সদস্য অমরবাবুর অবৈধ সম্পর্কের মধ্যে। আসলে, সুন্দরবনের নবগঠিত সমাজে এখনও আদিমতার প্রভাব সুপ্রকট। জীবনে যৌনচেতনা (Libido) ও হৃদয়ের দাবি অর্থাৎ দেহকাঙ্খাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে কোন নৈতিক চেতনা কিংবা পাপবোধের উদয় হয় না। উপন্যাসে, পারুলের স্বামী নীলকণ্ঠ, তথাপি বউদি কনকার গৃহে যে রাত্রি-যাপন করে। কনকার মধ্যে 'নোনাজলের অন্তঃস্রোত'। পারুল অভিমানে গৃহ ত্যাগ করলেও কনকার কোন ভাবান্তর হয় না। তার স্পষ্ট উপলব্ধি : ''মেয়েটা গাঙ পাড়ে থাকলেও গাঙ দ্যাখছে নি কোনও দিন! নোনামাটিতে বাস করলেও নোনামাটি জিবে দেয় নাই লো... বুঝে নি সৌ স্বাদ।''(পৃ. ৫০) গাঙ-পাড়ে নতুন গজিয়ে ওঠা সমাজ নোনাজলের স্বাদ পক্ষান্তরে পরকীয়ার আস্বাদ — জীবনের অন্য এক দাবি বলেই স্বীকৃতি দেয়।

কামিল্যার সন্তান বিশুর পত্নী ছায়ার চরিত্রেও লিবিডো (Libido) তাড়না। ছায়া, স্বামী বিশুকে শোনায়, 'ছিকলি ভালো না হইলে পাখি থাকে? উড়তি ভালবাসে গো!' তাই সে দাম্পত্য শৃঙ্খল ছিন্ন করে, নিঃসাড়, বিপন্ন, রুগ্ন স্বামীকে ফেলে রেখে পঞ্চায়েত বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যায় একমাত্র সন্তান ভজাকে, পীড়িত-স্বামীকে-উপেক্ষা করে। কামিল্যা তখন বিশু ও নাতি ভজাকে নিয়ে চলে যায় নিজের ঘরে। নিঃসঙ্গ ছায়া তখন পঞ্চায়েতবাবুর বুকে আশ্রয় খোঁজার বৃথা চেষ্টা করে।

''হাত বাড়িয়ে পঞ্চায়েতবাবুকে ধরে, ওরা সবতো আমাকে ফেলি গেল'। পঞ্চায়েত বাবুর চোখে মুখে প্রসন্নতা— 'সকলে সব জিনিসের কদর বুঝে?' মানায় তোমার সঙ্গে? খুশি করে? মনে ধরে?' ছায়া পঞ্চায়েতবাবুর হাত আঁকড়ে কাছে টানে'— 'মানায় কিনা, কইবো কেমন করে? যাকে মনে ধরে, তানকে পাবা যায়।''

রোগাক্রান্ত বিশুকে উপেক্ষা করে পরকীয়ায় মত্ত ছায়া— 'হাতের মুঠোয় পঞ্চায়েতের হাত, তখনও ছাড়ে না ছায়া'।

ঔপন্যাসিক স্বল্প পরিসরে পারুল-সীতাকে উপস্থাপিত করে তাদের হৃদয়যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেন। স্বামীগৃহ পরিত্যাগী— পারুল সীতা, দুজনেই। পিতৃগৃহেই তাদের ঠাঁই। তাই জীবনধারনের উপযোগী রসদ তারা নিজেরাই সংগ্রহ করে। 'সুন্দরিকা দোয়ানিয়ায় তারা মীন ধরার কাজ করে। ছেলেবেলার বন্ধু হলেও মীন ধরার ক্ষেত্রে তারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। পারুল সহজে জাল ভাসায় জলে কিন্তু সীতা জাল বাঁধতে হিমশিম খায়। 'আসু না। জল ফুলছে— জল গুছাতে পারছি না, আমি মীন পাইব নি।' হতাশায় কেঁদে ফেলে সীতা। জীবনযন্ত্রণার সকরুণ আর্তি ঔপন্যাসিক চিত্রিত করেন এভাবে।

সীতার জীবনযন্ত্রণা পাঠককে অবশ্যই দাগ কাটে। পাঁচ-পাঁচবার বিয়ে হয়েও সীতা কোথাও থিতু হতে পারেনি। বাপের বাড়িতে পারুলের মতই অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে আছে। দু'জনের বিবাহিত জীবনের সাজুয্য আছে বলেই ঔপন্যাসিক পারুলের পাশে সীতাকে এঁকেছেন। দুই বন্ধুর কথোপকথনে সীতার যন্ত্রণাকে উন্মুক্ত করেন ঔপন্যাসিক :

— 'কে আইছিলো সেদিন যে ভাত খাইলুনি ? শেষেরটা না তার আগের টা ?

— ধু, তারা আইলে ঝাঁটার পিটানী দুবো।'

সেই অবসরেই ঔপন্যাসিক সীতার হৃদয়োন্মোচনের বর্ণনা করেছেন। কোন স্বামীর প্রতি তার মোহ নেই। যাদব মাঝির প্রতি তার 'ভীষণ টান'। যাদব এতদিন পর নদী থেকে ফিরছে। তার ফিরে আসার 'বাতাস' সীতার 'বুকে লাগে'। 'রক্তের মানুষ কদ্দিন পর গাঙ সমুদ্র ভাজিয়ে ফিরছে। তাই তাকে এক পলক দেখতে সীতার 'মনের মধ্যে তাড়া'। সীতার নিঃস্ব, শূন্য, রিক্ত হৃদয়ে যাদবের উপস্থিতি— তাকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়।

স্বামীগৃহ পরিত্যাগী পারুলের সঙ্গে নগেনের হৃদয়াগত আকর্ষণ লেখক আশ্চর্য কৌশলে ফুটিয়ে তোলেন— মনস্তত্ত্ববিদের মতো। পারুলের সংগৃহিত মীন নগেনকে বিক্রি করে। কিন্তু দরদামের পূর্বেই নগেন ঝিনুক বসিয়ে মীনগুলো তুলে 'জাবরে' ফেলছে, পট করে নগেনের হাত ধরে থামায় পারুল—

" 'কত করে শ' দিবে কথা হইলো নি যে' — কালো চেহারায় পুরুষ মাংসে নরম হাতের পারুল। রোদে পুড়ে যায় নগেন। অবশ গলায় বলে— 'বাজারে তো শ'য়ে বারো টাকা, তোমার না হয় চৌদ্দ ?'

— উঁঃ সরু গলায় দীর্ঘ সে স্বর।— 'নামখানায় শ'য়ে সতেরো-আটারো বাজার যাইছে'—

পারুল জোরে হাতটা আটকে রাখে। বাধা দিতে নয়, বন্ধন করতেই। প্রশ্রয়ের স্পর্শ ওতো। নিজের যে মানুষ, তাকে তো ধরতে গেলেই বড় জা এসে দাঁড়াতো। বড় আফশোস। ফরসা হাতে কালো কাজ। সাদা ঝিনুকের গহ্বরে রোদ লেগে তপ্ত আভা। গলে যায় ব্যাপারি নগেন, পনেরো ?

ভিজে যায় পারুল। ধ্বস্ত রমনী স্বস্তিতে হেলিয়ে শুধু সায় দেয়— "হু।"(পৃ. ১৬৭)

ঔপন্যাসিক এভাবে দক্ষ মনোবিদের মতো পারুলের হৃদয়-উন্মোচন করেছেন— শালীনতার মাত্রাকে অতিক্রম না করে।

ঔপন্যাসিক গ্রামীণ লোকসংস্কার সম্পর্কেও সচেতন। উপন্যাসে তার প্রতিফলন। যাত্রাকালে ডিম দর্শন নিষিদ্ধ। শ্রীনিবাসবাবুর দোকানের পিঞ্জরাতে ডিম ঝুলতে দেখে খরিদ্দার বলে—

— 'সকাল বেলায় ওই ডিমগুলো ঝুলাইছেন। বড় অযাত্রা খাদ্য তো!' শ্রীনিবাসবাবু পেতলের ঘটিটা বের করে খরিদ্দারকে বুঝ দান করে— 'বুঝলে জানা বাবু, ওই ডিম-আন্ডায় হাত দিলে ঘটির জলে হাত ধুয়ে তবে অন্য মালে হাত লাগাই।'

— শুধু সংস্কার নয়, সংস্কার প্রতিবিধানের পন্থাও বাৎলে দেন ঝড়েশ্বর।

ভাষা প্রয়োগেও ঔপন্যাসিক আঞ্চলিকতা রক্ষা করেছেন। ঔপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজস্ব গোষ্ঠী ভাষায় কথা বলছে। বলাবাহুল্য সে ভাষা মেদিনীপুর থেকে আগত মানুষেরই ভাষা। কেন না, জঙ্গল হাসিল কালে বন্যাবিধ্বস্ত মেদিনীপুর বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী বিহার ঝাড়খণ্ড থেকে লোক দলে দলে এসে ভিড় করেছিল। বিশেষ করে কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, কুলতলি, গোসাবাতে তাদের আধিক্য চোখে পড়ে। ফলত: প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্য ভাষায় — বিচিত্র বিমিশ্রণ দেখি। কনকা ও পারুলের কথোপকথনে সেই ভাষাই লক্ষ্যণীয়। —

"— যাও কোনটি?

— যৌখানেতে মন চায়

— তাই বলে অতো ভোরবেলায় ওই কচ্চি বাচ্চা লিয়া?

— আমার বাচ্চা আমি বুঝবু...

— বড্ড বড় বড় বুলি ফুটছে না? বড়জনদের মানছুনি।

— হুঁ, মানছি বলেই তো ঘর ফাঁকা রাখি চলে যাইটি, উদোম খাও।"

রেখাঙ্কিত পদগুলি মেদিনীপুরী উচ্চারণে সহজেই লভ্য। কোথায় > কোনটি, নিয়ে >লিয়ে, বুঝবু >বুঝব, মানছিস না > মানছুনি, যাচ্ছি > যাইটি, — ইত্যকার পরিবর্তন মেদিনীপুর থেকে আগত মানুষের কথ্য ভাষার এক রূপ।

আঞ্চলিকতা আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফরাসী ঔপন্যাসিক Jean Giono'র উপন্যাস 'Colline'(১৯২৮), কিংবা Henri Basco-র 'Le mas Theotime (১৯৪১) উপন্যাসে ফ্রান্সের প্রভেন্স অঞ্চলের জীবনচিত্র,[১২] কিংবা শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির জীবনযাত্রা, তারাশঙ্করের বীরভূম ও কোপাই তীরবর্তী জীবনচিত্র,

এবং মানিকের পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রা — সাহিত্যের আকাশে চির ভাস্বর হয়ে আছে। কিন্তু বাংলা উপন্যাসে 'লোকায়ত পৌরুষ'-এর কথা সঞ্চারিত হয়নি বলে আক্ষেপ করেছিলেন দেবেশ রায়। বাংলার 'এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল, আর এই সমুদ্রকে নিয়ে অঙ্কিত করে যে মানুষ, সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না।''[১৩] এই আক্ষেপের অবসান ঘটাবে ঝড়েশ্বরের গল্প ও উপন্যাসগুলি। তাই পরবর্তীতে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন— 'যদিও পৃথিবীর একটি গোটা সমুদ্রেরই নাম — বঙ্গোপসাগর, তবু বাংলা সাহিত্যে, বা বলা যায় ভারতীয় সাহিত্যেই সমুদ্র তেমন করে ঢোকে নি। কন্নড় সাহিত্যে শিবরাম কায়স্থর 'মাটির টানে' উপন্যাসে আর তামিলে থোপিল মোহম্মদ মিরণ (জন্ম-১৯৪৪)-এর গোটা তিনেক উপন্যাসে সমুদ্র আর সৈকত জনপদের অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও শারীরিক বেঁচে থাকা— মরে যাওয়ার অনুল্লেখ অজস্র দৈনন্দিন গল্প বলা হয়েছে।... আর বাংলায়, ঝড়েশ্বরের গল্প ও উপন্যাসগুলিতে সমুদ্র আর মানবজমিনের এই দেশ-দ্বন্দ্ব''[১৪] প্রকট রূপে ফুটে উঠেছে।

অভিজ্ঞতা, স্থানিক রঙ, আঞ্চলিক ভাষা— এ সবের উর্দ্ধে ঔপন্যাসিকের মৌল উপজীব্য হল— গভীর জীবনবোধ। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড জগৎ গড়ে তোলার উপযুক্ত জীবনবোধ' — যে ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তোলেন — সেই শ্রেষ্ঠ। 'ইতিহাসের কঙ্কালের উপর ঝড়েশ্বর গভীর জীবনবোধের আচ্ছাদনে আবৃত করেছেন 'স্বজনহীন' উপন্যাসটিকে। এই Closeness of relation বা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার''[১৫] জন্যই স্বজনভূমি 'সার্থকতার সীমা স্পর্শ করেছে।

তেভাগা আন্দোলনের এক অনালোকিত ইতিহাসের সঙ্গে প্রান্ত সুন্দরবনের Closeness of relation-এর মিশ্রণ ঘটিয়ে — 'স্বজনভূমি-কে সার্থক করেছেন। এখানেই ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

১. সুকুমার দাস : তেভাগা আন্দোলন ও সুন্দরবন
'শ্রীখণ্ড সুন্দরবন'- সম্পা: দেবপ্রসাদ জানা,
দীপ প্রকাশন, ২০০৫

২. ধূর্জটি নস্কর : সুন্দরবনের লোক সাহিত্য ও বিচিত্র রচনা,
শ্যামলী পাবলিকেশন, কলি-৬, পৃ.-৫৫

৩. ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল : সুন্দরবনের তেভাগা
'সমকালের জিয়নকাঠি', সম্পা: নাজিবুল ইস্‌লাম
সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, ২০০৮

৪. অনাদি কুমার মহাপাত্র : ভারতের জাতীয় আন্দোলন,
সুহৃদ পাবলিকেশন, কলি-৭৩, পৃ: ২১১

৫. তদেব পৃ - ঐ

৬. সুকুমার দাস : তেভাগা আন্দোলন ও সুন্দরবন
'শ্রীখণ্ড সুন্দরবন', সম্পা: দেবপ্রসাদ জানা,
দীপ প্রকাশন, ২০০৫

৭. তদেব :

৮. তদেব :

৯. ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল : সুন্দরবনে তেভাগা - 'সমকালের জিয়নকাঠি'
সম্পা: নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, সুন্দরবন বিশেষ
সংখ্যা, ২০০৮

১০. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে রূপ ও রীতির পালাবদল,
প্রাক্‌কথন, দে'জ, কলি-৭৩, পৃ:-৩১

১১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, কলি-৭৩,
পৃ: ১৪

১২. ড. রামেশ্বর 'শ : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিচিত্র প্রসঙ্গ,
পুস্তক বিপণী, ২০০৮

১৩. দেবেশ রায় : উপন্যাস নিয়ে, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৪১

১৪. দেবেশ রায় : ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠগল্প,
ভূমিকাংশ, দে'জ, ২০০৪, কলি-৭৩, পৃ-১০

১৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ, কলি-৭৩

□ **লেখক: গবেষক, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক, দেবীপুর এইচ. এম. বিদ্যাপীঠ**